# আল মুহাদ্দিসাত

মুসলিম নারীদের হাদিসচর্চার ইতিহাস

**ড. মুহাম্মাদ আকরাম নদভি**

**ভাষান্তর**

| | |
|---|---|
| মিজান রহমান | মোমতাজুল করিম |
| মারদিয়া মমতাজ | রাফে সালমান |

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

# সূচিপত্র


- মুখবন্ধ ১৫
- ভূমিকা ২৭
- মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও সুন্নাহর প্রভাববলয় ৩১
- কুরআন ও হাদিসের আলোকে নারীর অধিকার ৩৬
- নারীর নিজ কাজের ফলে প্রতিষ্ঠিত নারীর অধিকার ৪৩

প্রথম অধ্যায়
**হাদিস বর্ণনার আইনি শর্ত**

- সাক্ষ্য ও রেওয়ায়েত ৪৮
- সাক্ষ্যদান ও রেওয়ায়েতের মধ্যে পার্থক্য ৫০
- নারীর হাদিস বর্ণনার আইনি বৈধতা ৫২
- নারী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসসমূহের প্রকাশ্য অনুমতি ৫৬
- ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা.)-এর হাদিস ৫৯
- অন্য উদাহরণ; আয়িশা (রা.)-এর একটি হাদিস ৬০

দ্বিতীয় অধ্যায়
**হাদিস অনুসন্ধানকারী ও হাদিসের শিক্ষার্থী হিসেবে নারী**

- শিক্ষাদানের দায়িত্ব ৬৭
- সন্তানদের শিক্ষাদান ৬৯
- সন্তানদের সুন্নাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখা ৭২
- তরুণী ও নারীদের ইলমি আলোচনাসভায় অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান ৭৩
- নারীদের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের দায়িত্ব ৭৪
- অনুসরণীয় নারীদের জীবনাচরণ ৭৬
- নারীদের নিজেদের প্রচেষ্টা ৮০
- নারীরা যা জিজ্ঞেস করতেন ৮২
- জ্ঞান অর্জনের পথে লজ্জা ৮৪
- সাহাবিগণের নিকট নারীদের জ্ঞানার্জন ৮৫
- হাদিসের সংরক্ষক হিসেবে নারী ৮৬
- বিভিন্ন গ্রন্থে টীকা যুক্তকরণ ৯২
- যাচাইকরণ ও সংশোধন ৯৩

তৃতীয় অধ্যায়

## হাদিস শিক্ষার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, ভ্রমণ, হাদিস শিক্ষার স্থান ও শিক্ষার ধরন


◈ হাদিস শিক্ষার আসর ৯৫
◈ হজ; বিদায় হজ ৯৮
◈ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান ১০২
◈ ভ্রমণ ১১০
◈ হজযাত্রা ১১১
◈ সেকালে হাদিস শিক্ষার স্থান ১১৫
◈ বাড়ি ১১৬
◈ মসজিদ ১২০
◈ বিদ্যাপীঠ ১২১
◈ হাদিস সংগ্রহের পদ্ধতি ১২৩
◈ সামাআ ও ইজাজার সংরক্ষণ ১২৯
◈ ইজাজার অনুসন্ধান ১৩১
◈ ফাতিমা বিনতে সাদ আল খায়ের (৫২৫-৬০০ হি.) ১৩৩


চতুর্থ অধ্যায়

## নারীদের শিক্ষকগণ


◈ পারিবারিক শিক্ষকগণ ১৩৯
◈ স্থানীয় শিক্ষকগণ ১৪৪
◈ মুসাফির শিক্ষকগণ ১৪৫
◈ অন্য শহরের শিক্ষকদের থেকে হাদিস শেখা ১৪৮
◈ শিক্ষকগণের সংখ্যা ১৫০


পঞ্চম অধ্যায়

## পড়াশোনার বিষয়


◈ প্রথম তিন শতাব্দী ১৫২
◈ চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী ১৫৩
◈ সপ্তম থেকে নবম শতাব্দী ১৫৮
◈ নবম শতাব্দীর শেষ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী ১৬৩
◈ চতুর্দশ শতাব্দী ১৬৬
◈ নারীরা যে সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন ১৬৮
◈ আল মুয়াত্তা ১৬৮

◈ আল জাওয়ামি ১৬৮
◈ আস-সুনান ১৭৩
◈ আল মাসানিদ ১৭৪
◈ আল মাআজিম ও আল মাশইখাত ১৭৫
◈ আল আরবায়ুনাহ ১৭৮
◈ আল আজ্জা ১৭৯
◈ আল মুসালসালাত ১৮০
◈ উম্মে হানি বিনতে নুরুদ্দিনের পাঠ্যতালিকা ১৮২

ষষ্ঠ অধ্যায়

## জ্ঞান প্রসারে নারীর ভূমিকা

◈ সাহাবিগণ ও তাঁদের পরবর্তী সময়ের আলিমগণ ১৮৬
◈ প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম—যারা নারী সাহাবিদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন ১৮৯
◈ যে সমস্ত স্বামী নিজ স্ত্রীদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন ১৯১
◈ যে সমস্ত সন্তান তাদের মায়ের নিকট শিখেছেন ১৯৪
◈ যে সন্তানগণ নিজের মায়ের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন ১৯৬
◈ নারী আলিমগণের কাজের পদ্ধতি ১৯৯
◈ বিনামূল্যে শিক্ষাদান, ছোটো ছোটো উপহার গ্রহণ ২০৫
◈ তাঁদের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ২০৬
◈ শুহাদা বিনতে আবু নসর আহমাদ ইবনুল ফারাজ আল বাগদাদিয়ার বিখ্যাত শিক্ষার্থীগণ ২০৭
◈ জয়নব বিনতে কামালের সামাআ ক্লাসের ধারাবাহিকতা ২১১
◈ শিক্ষার্থীদের নাম (জানা থাকা সাপেক্ষে মৃত্যুর তারিখ, সংশ্লিষ্ট স্থান) ২১২
◈ মুহাদ্দিসাতগণ যেভাবে হাদিস বর্ণনা করেছেন ২১৮
◈ শব্দের বর্ণনা ২১৮
◈ শিক্ষককে পড়ে শোনানো ২২৩
◈ চিঠিপত্র আদান-প্রদান ২২৬
◈ ইজাজা ২৩৩
◈ হাদিস বর্ণনা ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে জমায়েত ২৩৩
◈ বাড়ি ২৩৩
◈ মসজিদ ২৩৫
◈ মাদরাসা ২৩৭
◈ অন্যান্য স্থান ২৩৯

সপ্তম অধ্যায়

## নারীদের হাদিস ও বর্ণনাসমূহ


- সিহাহ সিত্তায় নারীগণের হাদিস ২৪১
- বর্ণনাকারীদের বাগ্মিতা ২৪৬
- নারীগণের হাদিসের ভিত্তিতে প্রণীত ফিকহ ২৫৪
- সুরাইয়া আল আসলামিয়ার হাদিস ২৫৪
- বুশরা বিনতে সাফওয়ান-এর হাদিস ২৫৬
- উম্মে আতিয়ার হাদিস ২৫৭
- রিফায়া আল কুরাজির স্ত্রীর বিষয়ে আয়িশা (রা.)-এর হাদিস ২৫৭
- বিভিন্ন হাদিস সংকলনে নারীদের বর্ণনা ২৫৮
- জাওয়ামি ২৫৮
- সুনান ২৬২
- মুসনাদ ২৬৫
- মুয়াজিম ও মাশাইখাত ২৬৭
- আরবাউনাত বা চল্লিশ হাদিস ২৬৯
- আজ্জা ২৭০
- মুসালসালা ২৭৪
- তাঁদের বর্ণনার প্রাচুর্য ২৭৫
- নারীদের বর্ণনাসমূহের সংকলন ২৮২
  - মুসনাদে আয়িশা ২৮২
  - আল ইসতিয়াব লিমা ইসতাদরাকাতহু আয়িশা আলাল আসহাব ২৮৩
  - মুসনাদ ফাতিমা ২৮৪
  - জুজ বিবা ২৮৪
  - মাশাইখা শুহদাহ ২৮৬
  - মাশাইখা খাদিজা ২৮৬
  - মাশাইখা কারিমা ২৮৭
  - মাশাইখা আজিবা ২৮৭
  - মাশাইখা সাইয়্যিদা আল মারানিয়া ২৮৮
  - জুজ নুদার বিনতে আবু হাইয়ান ২৮৮
  - মাশাইখা ওয়াজিহা আস-সাইয়্যিয়া ২৮৮
  - মাশাইখা জয়নব আস-সুলামিয়া ২৮৯
  - জয়নব বিনতে আল কামাল ২৮৯
  - মাশাইখা ফাতিমা বিনতে ইবরাহিম আল মাকদিসিয়া ২৯০

- মাশাইখা জয়নব বিনতে খাববাজ ২৯০
- মুজাম মরিয়ম আন-নাবুলসিয়া ২৯১
- মুজাম মরিয়ম আল আজরাইয়া ২৯১
- মাশাইখা হাসানা আত-তাবারিয়া ২৯১
- মাশাইখা আয়িশা বিনতে ইবনে আবদুল হাদি ২৯১
- মাশাইখা ফাতিমা বিনতে খলিল ২৯২
- মাশাইখা আয়িশা বিনতে আল আলা আল হাম্বলি ২৯২
- মাশাইখা জয়নব বিনতে আল ইয়াফিয়ি ২৯৩
- মাশাইখা আসমা আল মাহরানিয়া ২৯৩
- উম্মে কিরাম উনস বিনতে আবদুল কারিমের আরবাউন ২৯৪
- মাশাইখা জাহিদা বিনতে আজ-জাহিরি ২৯৪
- হুমাইদার হাদিস লেখা ২৯৪
- খুনাসা-এর নোট ২৯৪
- মাশাইখা আস-সিত্ত ফাতিমা ২৯৫
- নারী শিক্ষকগণের মাধ্যমে উচ্চতর ইসনাদ লাভ ২৯৫


অষ্টম অধ্যায়

## নারীগণ ও হাদিসের সমালোচনা


- বর্ণনাকারীগণের মূল্যায়ন ২৯৮
- নারী বর্ণনাকারীগণের তাদিল ৩০২
- নারী বর্ণনাকারীদের 'জারহ' ৩০৩
- নারীদের হাদিসের মূল্যায়ন ৩০৫
- নারী কর্তৃক বর্ণনাকারীদের মূল্যায়ন ৩০৭
- 'তাদিল' ও 'জারহ'-এর ব্যাপারে নারীগণের ভূমিকা ৩০৭
- নারী কর্তৃক তাদিল ও জারহ-এর উদাহরণ ৩০৮
- হাদিস পর্যালোচনায় নারীগণের ভূমিকা ৩১০
- হাদিসকে কুরআনের আলোকে যাচাই করা ৩১০
- হাদিসকে তার চেয়ে মজবুত হাদিসের সাথে তুলনা করা ৩১১
- কোনো হাদিসকে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহর সাথে মিলিয়ে দেখা ৩১৩
- হাদিসকে এর প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে মূল্যায়ন করা ৩১৪
- কোনো হাদিসের ওপর আমল করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না, সে আলোকে যাচাই করা ৩১৫
- কোনো হাদিসকে অর্থের যথার্থতার আলোকে যাচাই করা ৩১৫

নবম অধ্যায়

## স্থান ও কালভেদ : সংক্ষিপ্তসার


- ১ম পর্যায় : ১ম ও ২য় হিজরি শতক ৩১৭
- ২য় পর্যায় : ৩য়-৫ম হিজরি শতক ৩২০
- ৩য় পর্যায় : ৬ষ্ঠ-৯ম হিজরি শতক ৩২৬
- ৪র্থ পর্যায় : ৯ম-১৫শ হিজরি শতক ৩৩১
- অঞ্চলভিত্তিক পর্যালোচনা ৩৩৫
  - হিজাজ ৩৩৫
  - ইরাক ৩৩৬
  - আশ-শাম (বৃহত্তর সিরিয়া) ৩৩৭
  - মিশর ৩৩৯
  - স্পেন ও মরক্কো ৩৪২
  - খোরাসান ও ট্রান্সজেনিয়া অঞ্চল ৩৪৩
  - ভারত ৩৪৩


দশম অধ্যায়

## ফিকহ ও আমল


- নারী আলিমদের ফিকহচর্চা ৩৪৭
- কুরআনের জ্ঞান ৩৪৭
- হাদিসের জ্ঞান ৩৫১
- ফকিহা ৩৫২
- ফতোয়া প্রদানকারী নারীগণ ৩৫৪
- পুরুষ ও নারীদের মাঝে বাহাস ৩৫৬
- নারীদের ফিকহের ওপর ফকিহদের নির্ভরতা ৩৫৭
- নারীদের যেসব মতামত নিয়ে অন্যরা বিতর্ক করেছে ৩৫৮
- আমল ৩৫৯

# মুখবন্ধ

এই বইটিকে আরবি ভাষায় রচিত অপ্রকাশিত জীবনী অভিধানের মুকাদ্দিমা বা ভূমিকার অনুবাদ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অভিধানটি ইসলামের ইতিহাসে নারী হাদিসবিশারদদের নিয়ে রচিত। বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে মূলের অনেকাংশই রূপান্তর ও পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর প্রাথমিক কারণ হলো—অভিধানের মূল কাজের সঙ্গে তাতে উপস্থাপিত অনেক সামগ্রী (মানচিত্র, রেখাচিত্র, অন্যান্য চিত্র) সংযুক্ত ছিল না বলে সেগুলো প্রয়োজন অনুসারে সংযুক্ত করতে হয়েছে। আরবি পাঠকদের চেয়ে ইংরেজি পাঠকদের প্রত্যাশার পার্থক্যও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ। আমি জানি, পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ে কিছু প্রশ্ন আসবে। ফলে এখানে কিছু ঘোষণা দিয়ে রাখতে চাই। ইংরেজি পাঠকদের প্রত্যাশা নীতিগতভাবে আমাকে বলতে বাধ্য করছে, এই বইটি কী—সেটি ব্যাখ্যার মতো বেমানান কাজের চেয়ে বরং এই বইটি মূলত কী নয়, সেটি বলাই ভালো। সুতরাং শুরু করতে চাই এই বলে—এটি নারী অধ্যয়ন শাস্ত্রের (Women's Studies) ওপর কোনো অনুশীলনমূলক বই নয়। এই বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞও নই। তবে আমার এই অজ্ঞতা স্বীকারকে উদাসীনতা বিবেচনা করাও উচিত হবে না। বরং আশা করি, নারী অধ্যয়ন শাস্ত্রে দক্ষ পণ্ডিতগণ বইয়ে বর্ণিত তথ্যসমূহকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে।

ইসলামি সমাজে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যবান ও যৌক্তিক বিতর্ক উত্থাপনের আগে যেকোনো ব্যক্তিরই প্রচুর পরিশ্রমের দরকার রয়েছে। এর জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ ও গোড়ার প্রস্তুতিগুলো হলো—

**তথ্য নির্বাচন ও বিন্যাসকরণ :** অভিধান থেকে নির্দিষ্ট একটি বিষয় নির্বাচন এবং সেটা সুশৃঙ্খলভাবে একত্র করা এ ধরনের কাজের প্রথম ধাপ। যেমন, আমি এখানে অভিধানে বর্ণিত অন্তত বিশজন নারীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ভূরিভূরি তথ্য একত্রিত করেছি। তাঁদের সবার জীবনী স্বতন্ত্রভাবে অধ্যয়ন করা সম্ভব। ফাতিমা বিনতে সাদ আল খায়েরের বিষয়ে সামান্য চিত্রই উপস্থাপিত হয়েছে এখানে (বইয়ের পৃষ্ঠা : ১৩৫-১৩৯)। অথচ সেজন্য আমাকে দৃষ্টিপাত করতে হয়েছে কমপক্ষে অর্ধ ডজন পৃথক পৃথক বইয়ে। এজন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে বটে, কিন্তু অভিধানটি থেকে আপনি অন্তত এই নির্দেশনা পাবেন—ফাতেমা বিনতে সাদ আল খায়ের বিষয়ে পড়াশোনার জন্য আপনি কোন বই দিয়ে শুরু করবেন।

**পরিমাণগত বিশ্লেষণ :** স্থান, কাল ও রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক মুহাদ্দিসাতের বর্ণনা এই বইয়ে সংকলন করা হয়েছে। বইয়ের নবম অধ্যায় মূলত একটি বৃহৎ ছবির চুম্বকাংশ, যা অধিকতর বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

**ঐতিহাসিক ও প্রাসঙ্গিক পটভূমি :** কীভাবে বিভিন্ন স্তরের হাদিস সংগ্রহ এবং পারস্পরিক ভিত্তিতে আদান-প্রদান হয়, সে বিষয়ে এই বইয়ে কিছু রেখাচিত্র দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে আলোকপাত করা হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা, প্রশাসনিক কাঠামো, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের ধরন, আর্থসামাজিক মর্যাদা কীভাবে হাদিস অধ্যয়নকে প্রভাবিত করেছিল, কীভাবে হাদিস সংরক্ষিত হয়েছিল, সেসব ঐতিহাসিক ধারাপরিক্রমার সারনির্যাস।

**নির্দিষ্ট বিষয়ে দৃষ্টিপাত :** অনেক মুহাদ্দিসাতের নাম খেয়াল করলেই বোঝা যায়— তাঁদের প্রায় সবার পিতাই ছিলেন কাজি, ইমাম, হাফিজ ইত্যাদি বিভিন্ন অভিধা ও সামাজিক মর্যাদায় ভূষিত ব্যক্তিবর্গ। এ থেকে অনুমান করা যায়, তৎকালীন অগ্রসর পুরুষেরা নারী শিক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিবেচনায় নারীদেরকে তাঁদের থেকে কম সম্মানিত মনে করতেন না। যদিও সে সময় সামাজিক মর্যাদা ও কর্তৃত্ব নির্ধারিত হতো রক্ষণশীল ইসলামের মানদণ্ডে এবং মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তির গোড়া অ্যারিস্টটল ছিল না; ছিল রাসূলের সুন্নাহ।

নারীর জন্য কোনটা ঠিক, কোনটা ঠিক নয়—এই রকম বিষয়ে মানুষের বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের কারণে নারীবিদ্বেষী মতবাদ হিসেবে ইসলামকে প্রায়ই অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু মুসলিম সমাজে নারী নিগ্রহের ঘটনা থাকার কারণেই অভিযোগটি সত্য হয়ে যায় না, যদি না সত্যিকার অর্থেই ইসলাম নারীবিদ্বেষী হয়। এটা সত্য, বিভিন্ন মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারী নিগ্রহের যথেষ্ট উদাহরণ ও অভিযোগ রয়েছে। তথাপি কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর ব্যর্থতার জন্য ধর্মীয় ঐতিহ্য নয়; বরং স্থানীয় ঘটনা বা পরিস্থিতির প্রতিফলই সর্বোচ্চ দায়ী। কিন্তু টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন তথ্যচিত্রে পাকিস্তানের নারী নিগ্রহের ঘটনাকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, তুলনামূলকভাবে ভারতের নারী নিগ্রহকে সেভাবে দেখানো হয় না। কেননা, তাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে মুসলমানদের ওপরই নিবদ্ধ।

এর কারণ হিসেবে বলা যায়, ভারতের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত তরুণীরা পোশাকের পশ্চিমা শৈলীতে নিজেদের ঢেলে সাজাচ্ছে। অপরদিকে পাকিস্তান অথবা খোদ ভারতেরই মুসলিম তরুণীরা সেটা করছে না। পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের মুসলিমদের মতো তারাও চায় না—মুসলিম মানসে পশ্চিমা আচরণের আঁচ লাগুক কিংবা তাদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভেতর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ুক কর্তৃত্ববাদী আধুনিকতার বিষবাষ্প। ইসলামি জীবনাচরণের প্রতি নারীবাদী সমালোচকদের একধরনের উগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আগে থেকেই ছিল। ইদানীং অবশ্য কিছুটা হলেও সেটা কমতে শুরু করেছে। মুসলমানরা এই বিদ্বেষ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চেয়েছে বলেই স্বাভাবিকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

একজন বহিরাগত হিসেবে আমার মনে হয়েছে, নারীবাদী অ্যাজেন্ডার দুইটি বিশেষ দিক রয়েছে। একটি ব্যাবহারিক, অন্যটি তাত্ত্বিক। ব্যাবহারিক দিকটি নারীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তির প্রশ্নে সোচ্চার। সমতা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি ইস্যুতে এই ব্যাবহারিক দিক দৃষ্টিপাত করে। ভালো মনের কোনো মানুষই এই অধিকারের প্রশ্নে বিতর্কে যাবেন না। সবার চোখেই ন্যায়বিচার একটি সদ্‌গুণ। সদ্‌গুণের সংজ্ঞা নির্ধারণ কিংবা তা বাস্তবায়নে মুসলমানদের কোনো একচ্ছত্র অধিকার নেই; বরং এই সদ্‌গুণ ধারণ করে যে নিজেকে আইনত সীমার ভেতরে রাখে,

মুসলমানরা তার প্রশংসাই করে। মুসলমানদের মধ্যে সৎকাজের প্রতিযোগিতা রয়েছে। এ বিষয়টি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার (মৃত্যু : ৭২৮ হি.) সুযোগ্য ছাত্র ইবনে কাইয়্যিম আল জাওজিয়াহর (মৃত্যু : ৭৫১ হি.) চিন্তাধারা দিয়ে বোধগম্য করা হয়তো কঠিন হবে।[১]

একজন শাফেয়ি আলিম বলেন—'শরিয়াহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে তাকে রাজনীতি বলা যায় না।' শরিয়াহর সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বলতে যদি এমন কিছুকে বোঝানো হয়—যা শরিয়াহ সমর্থন করে না, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু এর ব্যাখ্যায় যদি বলা হয়—শরিয়াহর বাইরে কোনো রাজনীতি হতেই পারে না, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই ভুল হবে। যখন যেখানে যেকোনো উপায়েই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, সেখানেই আপনি স্রষ্টার আইন এবং তাঁর নির্ধারিত ধর্মের বিধান খুঁজে পাবেন। ন্যায়বিচার বাস্তবায়নে দৃঢ়তার প্রশ্নে প্রশংসাময় আল্লাহ অত্যন্ত সচেতন, জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ। এমনকি একটি সূক্ষ্ম বিষয়েও তিনি ন্যায়বিচার কার্যকরের ব্যাপারে দৃঢ় ও অবিচল। যেভাবে তিনি এ গোটা জগতে আইনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, সরল এবং এ বিষয়ে তিনিই সমস্ত প্রশংসার যোগ্য। তিনি মূলত চেয়েছেন বান্দাদের জন্য কিছু নিয়ম নির্ধারণ করে দিতে, যাতে সকলের মাঝে নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে সমতার চর্চা হয়। যে কারও হাত ধরে, যেকোনো পন্থায়ই বাস্তবায়িত হোক না কেন, ন্যায়বিচার সর্বাবস্থায় ধর্মেরই অংশ; এর বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়।

নারীর প্রতি সীমাহীন অবিচার রোধের সংকল্প বা সদিচ্ছা মুসলিম সমাজে মোটাদাগে গ্রহণযোগ্য ও অনুমোদিত। কিন্তু নারীবাদী সমালোচকরা বিষয়টিকে ঘিরে যে তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণের মাধ্যমে প্রশ্নের জট পাকিয়ে ফেলেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও এটা মুসলিম চিন্তা-জগৎকে নাড়া দেয় এবং আমার নিকট কিছু প্রশ্ন আসে। প্রশ্নগুলো এমন—যে কাজটি একজন পুরুষ করতে পারে, একজন নারী তা কেন পারবে না? হতে পারে সেটা মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায়, আইনের ব্যাখ্যা প্রদান, মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফতোয়া প্রদান, নামাজে ইমামতি, সঙ্গী ছাড়া ভ্রমণ, মাথা না ঢেকেই ধর্মপরায়ণ হওয়া ইত্যাদি। এভাবে নারীর সমঅধিকারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মুসলমানদের অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়া হয়।

[১] অমুসলিম শাসনের অধীনে মুসলিমদের সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়ার বিভিন্ন বক্তৃতার আলোচনায় ইয়াহিয়া MICHOT-এর অনুবাদটি উদ্ধৃত করছি (২০০৬), ১০৫; অনুচ্ছেদটি আত-তুরুক আল হুকমিয়্যা (সম্পাদনা : এস. উমরান, কায়রো, ১৪২৩/২০০২), ১৭-১৮ থেকে।

# ভূমিকা

মানুষজন এটা জেনে চমকে যায়, ইসলামি অনুশাসনের ভেতরে জীবনধারণ করেও একজন নারী চিন্তাবিদও হতে পারেন। সেই চিন্তাচর্চার জগতে নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে পারেন। ইসলামের আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে অর্জন করতে পারেন সূক্ষ্ম জ্ঞান। আবার সেই বিষয়ে মতামতও প্রকাশ করতে পারেন। প্রতিনিধিত্বকারী পশ্চিমা জগৎ মনে করে, ইসলামের সামাজিক নিয়মনীতিতে ধর্মের যতটা প্রভাব রয়েছে, অন্য কোনো ধর্মে ততটা নেই। আর একটা সমাজে ধর্মের প্রভাব যত বেশি হবে, ততটাই হ্রাস পাবে নারী প্রতিনিধিত্ব কিংবা নারীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হওয়ার সুযোগ।

পশ্চিমাদের এই রকম ধারণার পেছনের কারণ—তারা মনে করে, ধর্ম মানুষের সৃষ্টি এবং মূলত পুরুষদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। ফলে নারীকে বলিদান করে হলেও পুরুষেরা ধর্ম থেকে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নিতে চাইবে। কিন্তু মুসলমানরা কোনোভাবেই এমন ধারণা পোষণ করে না। এর একটা কারণ, তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে—কুরআন আল্লাহর বাণী। যদিও এটি মানুষের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে এবং এর প্রথম শ্রোতা রাসূল (সা.) ছিলেন আরবি ভাষাভাষী, তবুও কুরআন মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে সংকুচিত করে দেয় না।

গঠনগত দিক থেকে সামগ্রিক অর্থে কুরআন তথাকথিত সাহিত্যের মতো গল্প বলায় মনোযোগ দেয় না। কারণ, এটি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জীবনীভিত্তিক মহাকাব্য নয়। আবার এর নেই কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানাও। কোনো নির্দিষ্ট মানব প্রতিষ্ঠান তথা রাজত্ব বা পুরোহিততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কিংবা সে বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ পেশ করা থেকেও কুরআন বিরত থাকে। অন্যদিকে এটি অগোছালো কিংবা গভীরভাবে সংযুক্ত কিছু দুর্বোধ্য নৈতিক, আইনি কিংবা দার্শনিক কাজেরও সমাহার নয়।

বিশ্বাসীদের মতে, মানুষের বিদ্যমান বাস্তবতা থেকে সরাসরি ঐশী শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যম হলো আল কুরআন। কুরআন মানুষের বাস্তব জীবনের ওপর কিছু নির্দেশনা, কিছু সান্ত্বনা, শাস্তির ব্যাপারে সতর্কবার্তা ও পুরস্কারের ব্যাপারে ওয়াদার সমষ্টি। এটি মানুষকে পথ দেখিয়ে দেয়, কীভাবে পরকালীন দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য এই পৃথিবীতে একটি সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভব। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে—কুরআন হলো এক অদ্বিতীয় ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের উৎস। জীবন পরিচালনায় নৈতিক উপদেশ ও নির্দেশনার সমষ্টি জানিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কুরআন তাকে এই কর্তৃত্বের অধিকার দেয়, যার প্রতি এটি নাজিল করা হয়েছিল। ফলে কুরআন কর্তৃত্বের অধিকারী এবং রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহও এ কারণে কর্তৃত্বের হকদার।

ঐশী ওয়াদা মতে—জীবন পরিচালনার এই যুগল উৎসের নির্দেশনা ও কাঠামোর ভেতরে থেকেই বিশ্বাসীরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে। ফলে মুসলমানরা কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে কিছুই করতে পারে না। এই বইটি সেই কর্তৃত্বের জগতে নারীর প্রবেশের এক প্রামাণ্য দলিল।

ওহি ব্যতীত সাধারণ আইনগুলোর বিষয়ে মানুষজন আশা করে—আইন প্রণয়নকারীগণ নিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত হিসেবে একটা 'অন্ধকার পর্দার পেছন থেকে' তাদের জন্য আইন বা বিধিবিধান নির্ধারণ করবেন। কারা এর দ্বারা উপকৃত হবেন, কারা দুর্ভোগ পোহাবেন, সে বিষয়ে খোদ আইন প্রণয়নকারীরই জানার সুযোগ থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। কারণ, সর্বোত্তম মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গিও সব সময় পক্ষপাতদুষ্ট। ফলে মানবিক আইনপ্রণেতারা সব সময় তাদের রুচি ও আগ্রহের ওপর নির্ভর করে। তারা মনে করে—তাদের আগ্রহই দীর্ঘমেয়াদে সকলের উপকার সাধন করবে। তাদের প্রণীত আইন কিছু মানুষের ওপর অন্য মানুষের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। যেমন : গরিবের ওপর বিত্তবানের, নারীর ওপর পুরুষের কিংবা এক জাতির ওপর অন্য জাতির অগ্রাধিকার। তবে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে অতীতের ভুল শোধরানো সম্ভব। এটাই এসব আইনের ক্ষেত্রে একমাত্র সান্ত্বনা।

মুসলমানরা বিশ্বাস করে, কুরআন ও সুন্নাহ অতি নিখুঁতভাবে পক্ষপাতমুক্ত এবং মানবজাতির জন্য কার্যকর দিকনির্দেশনায় পরিপূর্ণ। কারণ, আল্লাহর জ্ঞান ও দয়া সবকিছুর ভূত-ভবিষ্যৎকে ছেয়ে আছে। ওই ঐশী নির্দেশনা থেকে মানুষের কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যাচাইয়ের দরকার হতে পারে, কিন্তু ঐশী নির্দেশনা হিসেবে খোদ কুরআন কিংবা হাদিসকে যাচাই করা নিষ্প্রয়োজন। সেই অনুসারে ইসলামি ঐতিহ্য হলো—কেউ 'আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেছেন...' বলার সাথে সাথেই সব বিতর্ক বা যুক্তির অবসান হয়ে যায়।

যেখানে কুরআনের কোনো বিধানকে সরাসরি প্রয়োগ করা যায় না, মুসলমানরা তখন আল্লাহর বার্তা প্রচারক হিসেবে ওই নির্দিষ্ট বিষয়ে রাসূল (সা.) কী করেছেন, সেটি তালাশ করে। আর রাসূল (সা.)-এর কাজের উদাহরণ এখন মুদ্রিত অবস্থায় বর্তমান। এগুলোকে বলা হয় হাদিস বা রাসূল (সা.)-এর বাণী।

# মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও সুন্নাহর প্রভাববলয়

নারীর প্রতি নেতিবাচক আচরণের কারণে মহাগ্রন্থ আল কুরআন জাহেলি যুগের মানুষদের তিরস্কার করে বলছে—

> ‘অথচ যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুখবর দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। যে বিষয়ে তাকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল, তার মনের কষ্টের কারণে সে (তার) জাতির লোকদের থেকে আত্মগোপন করে থাকতে চায় (এবং ভাবতে থাকে)—সে কি একে (সদ্যপ্রসূত কন্যা সন্তানকে) অপমানসহ গ্রহণ করবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। ভালোভাবে শুনে রাখো, (কন্যা সন্তান সম্পর্কে) ওরা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা অতিনিকৃষ্ট।’ সূরা নাহল : ৫৮-৫৯

কন্যা সন্তানের পেছনে ব্যয়ভারই সম্ভবত কন্যা সন্তানের প্রতি এ ধরনের নেতিবাচক আচরণের কারণ। সাধারণত পেশিশক্তি বৃদ্ধি কিংবা অর্থনৈতিক মুক্তির সম্ভাবনা হিসেবেই পুত্র সন্তান কামনা করা হয়। সে সময় আরব গোত্রগুলোতে কন্যা সন্তান জীবন্ত কবর দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। কুরআন এহেন ঘৃণ্য কাজের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করছে এভাবে—

> ‘যখন জীবন্ত কবর দেওয়া নিষ্পাপ শিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। সূরা তাকবির : ৮-৯

মানবাধিকার ও মানবিক দায়িত্ব—এই দুটো বিষয়ে নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই কুরআনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি একই রকম। নারী-পুরুষ উভয়ই এক আল্লাহর সৃষ্টি। একক ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা হিসেবে তাদের রয়েছে পৃথক পৃথক দায়বদ্ধতা। আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়ে কুরআনে বলেন—

> ‘হে মানবসম্প্রদায়! তোমার প্রতিপালককে ভয় করো; যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন একক ব্যক্তিসত্তা থেকে। তারপর সেখান থেকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া, সেই জোড়া থেকে সৃষ্টি করেছেন সকল নরনারী। ভয় করো সেই আল্লাহকে, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট আত্মীয়তার অধিকার দাবি করে থাকো এবং সম্মান করো তোমাদের জ্ঞাতিসম্পর্ককে।[২] নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্মদৃষ্টি রাখেন।’ সূরা নিসা : ১
>
> ‘তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে জোড়া বানিয়েছেন, যেন তার নিকট তোমরা পরম শান্তি লাভ করতে পারো।’ সূরা আ’রাফ : ১৮৯

---

[২] ‘ঘনিষ্ঠ আত্মীয়’: ‘আরহাম’ শব্দটি ‘রিহম’-এর বহুবচন; এর অর্থ হলো গর্ভ। তবে এখানে এর আক্ষরিক অর্থ না বুঝিয়ে ‘নিকটাত্মীয়দের’ বোঝানো হয়েছে।

নারী ও পুরুষকে একই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

'মানুষ ও জিন জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।' সূরা জারিয়াত : ৫৬

কুরআনের পারিভাষিক শব্দ 'আবদ' দ্বারা আল্লাহর ইবাদতকারী ও আল্লাহর দাস উভয়টিই বোঝায়। আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্বপালনের গুণাবলি যে প্রচেষ্টা থেকে আসে, তা নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে একই রকম। এই বিষয়টি কুরআনের একটি বহুল পরিচিত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে সাইবার বর্ণিত একটি হাদিসে সেই আয়াত এবং আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে—

'নবি করিম (সা.)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.)-কে বলতে শুনেছি— আমি নবি করিম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, পুরুষদের কথা কুরআনে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের (নারীদের) কেন সেভাবে উল্লেখ করা হয়নি? ওই দিনই রাসূল (সা.) বক্তব্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিম্বারে উঠলেন এবং আমাকে সে খবর দেওয়া হলো। ওই মুহূর্তে আমি মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিলাম। (খবর শুনে) আমার চুল বেঁধে ফেললাম এবং আমাদের বাড়ির একটি ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলছেন—হে মানুষগণ! আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ কুরআনে বলেছেন—"মুসলিম পুরুষ, মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ, মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোজাদার পুরুষ, রোজাদার নারী, যৌন অঙ্গসমূহের হেফাজতকারী পুরুষ, যৌন অঙ্গসমূহের হেফাজতকারী নারী, আল্লাহ তায়ালাকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ, আল্লাহ তায়ালাকে অধিক স্মরণকারী নারী, এদের জন্য আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও মহাপুরস্কার ঠিক করে রেখেছেন।"'[৩]

এই পৃথিবীতে পালনীয় কর্তব্য এবং পরকালে তার জবাবদিহিতার বিষয়ে দায়িত্বের ভার প্রত্যেককেই নিজ নিজ কাঁধে বহন করতে হবে। মানুষের দক্ষতা, দায়িত্বের বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন জীবের প্রতি নির্ধারিত কর্তব্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। আল্লাহ তায়ালা এমন কোনো দায়িত্ব নির্ধারণ করেন না, যা পালনের ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হয়নি।

ইসলামের মৌলিক চিন্তা-ভাবনার মধ্যে আমরা এমন কোনো ঐতিহ্য খুঁজে পাইনি, যেখানে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে মাধ্যম হতে হয়েছে; বরং আল্লাহর দাসত্ব কিংবা দুনিয়াবি বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর মাঝেই সমাধান নিহিত। কুরআন ও সুন্নাহর জগতে প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট কোনো গোত্রের সদস্য কিংবা নির্দিষ্ট কোনো লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হতে হয় না। এক্ষেত্রে নারীর ওপর পুরুষের বিশেষ কোনো প্রাধান্য নেই। এজন্য অর্জন করতে হয় না কোনো সামাজিক মর্যাদাও। যেমন, কুরআন চর্চার বিষয়ে গরিবের ওপর মনিবের কোনো অগ্রাধিকার নেই। এটি হলো কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপার।

---

[৩] আল মুস্তাদরাক আল হাকিম ৪১৬. উদ্ধৃত আয়াতটি হলো সূরা আহজাবের ৩৩-৩৫